অগস্ত্যের বিন্ধ্যাচল পাড়ি

বিমান নাথ

আমাদের পুরাণে এবং প্রচলিত গল্পগাঁথায় অগস্ত্য মুনির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। তাঁর বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম থেকে শুরু করে এক গণ্ডুষে সাগরের জল শুষে নেওয়ার গল্পে তাঁকে আমরা পুরাণের মুনিঋষির মধ্যে একজন অনন্য পুরুষ হিসেবে দেখি। তিনি দুর্বাসা মুনির মতো বদরাগি ছিলেন না, কিন্তু তাঁকে রাগালে কারও রক্ষা ছিল না। বাতাপি আর ইল্বল নামের দুই রাক্ষসভাইদের তিনি কৌশলে মেরে ফেলতে পিছপা হননি। তাঁকে বাতাপি-স্বরূপ পাঁঠার মাংস খাইয়ে যখন ইল্বল তার ভাইকে অগস্ত্যের পেট চিরে বেরিয়ে আসতে বলেছিল, ততক্ষণে অগস্ত্য বাতাপিকে হজম করে ফেলেছেন।

প্রণয়ের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সবার চেয়ে আলাদা। অগস্ত্য নিজেই তাঁর মানসকন্যাকে সৃষ্টি করে বিদর্ভরাজের কাছে রেখে এসেছিলেন। সেই মেয়ে লোপামুদ্রা বড় হয়ে ওঠার পর তাকে বিবাহ করেন অগস্ত্য। পরে যখন এক বার লোপামুদ্রা অগস্ত্যের কাছে অঙ্গসজ্জার জন্য রত্নাভরণ চেয়েছিলেন, তখন প্রথমে মুনিবর তাকে বোঝাতে বসেছিলেন। কিন্তু লোপামুদ্রা অগস্ত্যের কথায় কান না দিয়ে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করেছিলেন। তখন অগস্ত্য অন্য ঋষিদের মতো রেগে যাননি। স্ত্রীর জন্য রত্নালঙ্কার জোগাড় করে নিয়ে এসেছিলেন, যা দেখে বিস্মিত হয়ে লোপামুদ্রা স্বেচ্ছায় চিরদিনের জন্য অলঙ্কার ত্যাগ করেছিলেন।

আকাশের অগস্ত্য নক্ষত্রও (ক্যানোপাস্) যেন অন্য সব তারা থেকে আলাদা। দক্ষিণাকাশে অগস্ত্য হল সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র, এবং আকাশের ওই অংশে এমন উজ্জ্বল নক্ষত্র আর নেই বললেই চলে। শুধু তাই নয়, প্রায় তিনশো আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই নক্ষত্রটির গঠনও অদ্ভুত ধরনের। এবং সেই জন্য বিজ্ঞানীরা এর দূরত্ব নির্ধারণ করতে হিমশিম খেয়েছেন। গত দশকে হিপারকাস্ মহাকাশযান থেকে পাওয়া তথ্য থেকেই এর দূরত্ব সঠিকভাবে জানা গেছে। এমনিতে অগস্ত্যের রং দেখে তাকে সূর্যের চেয়ে ওজনে ভারী এবং উষ্ণ বলে মনে হয়, কিন্তু এই ধরনের 'সুপারজায়েন্ট' বা অতি-দানব নক্ষত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও সীমিত। বিশেষ করে এদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য কতটুকু হতে পারে সেটা নিয়ে বেশ অনিশ্চয়তা

রয়েছে। তাই তার দূরত্ব মাপার জন্য তার ঔজ্জ্বল্য ব্যবহার করা হয়নি, বরং মহাকাশে পাঠানো সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে জ্যামিতির নিয়মে তার দূরত্ব মাপা হয়েছে। এবং সেটা সম্ভব হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালে।

পৃথিবীর আকাশেও এই নক্ষত্রের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেহেতু আকাশে তার ঠিকানা হল একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে, সেই জন্য পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের বেশির ভাগ জায়গা থেকে তাকে দেখা যায় না।

উদাহরণের জন্য উত্তর আকাশের ধ্রুবতারার কথা ভাবা যাক। বিষুবরেখার ওপর কোনও জায়গায় দাঁড়ালে সেখান থেকে ধ্রুবতারাকে দেখা যাবে দিগন্ত ছুঁয়ে থাকতে। এর দক্ষিণে গেলে ধ্রুবতারাকে আকাশে দেখাই যাবে না। অগস্ত্য নক্ষত্রের ব্যাপারটা খানিকটা সেই রকম। তারাটা আকাশের দক্ষিণ মেরুর এত কাছে যে বেশি উত্তরে চলে গেলে তার দেখা পাওয়া অসম্ভব। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের উত্তরে গেলে আকাশে অগস্ত্য নক্ষত্র দেখা যাবে না। অর্থাৎ কাশ্মীর পেরিয়ে আরও উত্তরে গেলে আকাশে অগস্ত্য যাবেন অস্তাচলে।

আকাশে অগস্ত্য নক্ষত্র দেখে নিজের অবস্থান আন্দাজ করার একটা চমৎকার উদাহরণ আছে ইতিহাসে। ঘটনাটার সময় ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ। একুশ বছর বয়স্ক বাবর তখন তার জন্মভূমি ফারগানা (বর্তমানে উজবেকিস্তানের অন্তর্গত) থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেখানকার দুর্ধর্ষ মহম্মদ শৈবানি খানের হাত থেকে বাঁচার জন্য। তাঁর দিদি খানজাদা-কে শৈবানির সঙ্গে বিয়ে দিতে হয়েছে গত যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর। তারপর থেকে তাঁর পরিবারের লোকজন এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে দক্ষিণের দিকে ভাগ্যান্বেষণে চলেছেন। ১৫০৪ সালের শীতকালে তিনি বর্তমান আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। এই দুর্গম গিরিপথ দিয়ে এরপর কোথায় যাবেন এই নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। যেখানে পৌঁছেছেন সেখান পর্যন্ত শৈবানি ধাওয়া করবে কি না সেই নিয়েও দুশ্চিন্তা।

এমন সময় তিনি রাতের আকাশে এমন একটা নক্ষত্র লক্ষ করেছিলেন যাকে তিনি আগে কখনও দেখেননি, নাম শুনেছেন মাত্র। আকাশের দক্ষিণ দিকের সেই উজ্জ্বল তারাটাকে দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা 'সুহেল' (অগস্ত্য নক্ষত্রের আরব্য নাম) না হয়ে যায় না। মাথায় এই কথাটা ঢুকতেই বুদ্ধিমান বাবরের বুঝতে বাকি রইল না যে তিনি দক্ষিণের পথে অনেকটুকু চলে এসেছেন, নাহলে সুহেল-কে আকাশে দেখতে পারতেন না। মোটামুটি ভেবে নিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যতটা দক্ষিণে এসে পৌঁছেছেন, সেখানে আর যাই হোক শৈবানি খানের ভয় নেই।

তিনি 'বাবরনামা'-য় লিখেছেন যে তখন তিনি তাঁর সৈন্যদের জিজ্ঞেস করেছিলেন। জেনেছিলেন যে তারাও আকাশে 'সুহেল' দেখে সবাই আনন্দিত। ইতিহাস আর ভূগোলের একটা অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়েছিল যে শৈবানি খানের সৈন্যসামন্ত তখন কুন্দুজ অঞ্চল পর্যন্ত টহল দিচ্ছিল, যেখানকার অক্ষাংশ হল প্রায় সাঁইত্রিশ ডিগ্রি, এবং সুহেলকে শুধু তার দক্ষিণেই দেখা সম্ভব! তাই আকাশে অগস্ত্য দর্শন বাবরের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাবর লিখেছিলেন যে এভাবে আকাশে সুহেল-এর দর্শন নিশ্চয় তাঁর জীবনে সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে আসবে। আর এসেছিলও তাই।

এরপরেই বাবরের জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল। হিন্দুকুশ পেরিয়ে তিনি কাবুল শহর দখল করে নিয়েছিলেন, যে শহরটা তাঁর কাছে চিরদিনের প্রিয় হয়ে থাকবে। এখান থেকেই ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে ছয় বছরের মধ্যে শৈবানি খানকে হারিয়ে তাঁর দিদিকে উদ্ধার করেছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অগস্ত্য হল মূলত দক্ষিণাকাশের নক্ষত্র, এবং পৃথিবীর দক্ষিণ অংশেই তার পরিচিতি বেশি। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে অগস্ত্যমুনির গল্পের সঙ্গে এর একটা মিল আছে। দাক্ষিণাত্যে অগস্ত্যমুনির খুব প্রতিপত্তি, বিশেষ করে তামিলদের পৌরাণিক গল্পে। তামিল ভাষায় তাঁকে বলা হয় 'আগাত্তিয়ার', এবং মনে করা হয় তিনিই প্রথম তামিল ভাষার ব্যাকরণ লিখেছিলেন। এও মনে করা হয় যে তিনিই দাক্ষিণাত্যের আয়ুর্বেদ পদ্ধতি 'সিদ্ধা'র জন্মদাতা। এখনও সেখানকার 'সিদ্ধা' চিকিৎসার সময় অগস্ত্যমুনির নাম স্মরণ করে ঔষধ দেওয়া হয়। তিনি তাই একাধারে দাক্ষিণাত্যের পাণিণি এবং পতঞ্জলি। তামিলনাড়ু এবং কেরালার সীমান্তে এক পাহাড়চূড়ার নাম অগস্ত্যমালাই, যে পাহাড়ের গুল্মরাজি তাদের ভেষজগুণের জন্য বিখ্যাত। শুধু দাক্ষিণাত্যে নয়, অগস্ত্যমুনির গল্প সাগরপারের ইন্দোনেশিয়াতেও প্রচলিত। সেখানকার বোরোবুদুর মন্দিরে ঋষি অগস্ত্যের মূর্তি রয়েছে।

তবু অগস্ত্য যে আসলে উত্তর ভারতের বা আর্যাবর্তের লোক ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই (অবশ্য যদি ওই নামে সত্যিকারের কেউ তখন থেকে থাকেন)। সবচেয়ে পুরোনো বেদ ঋকবেদেই তাঁর এবং লোপামুদ্রার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখি ঋষি অগস্ত্য যুদ্ধে উদ্যত ইন্দ্র এবং মরুৎ-দের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করছেন। অগস্ত্য এবং লোপামুদ্রার মিলনের কথাও রয়েছে সেখানে।

অগস্ত্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কথা আমরা মহাভারতে এবং রামায়ণে জানতে পারি, যেখানে আমরা অগস্ত্যের বিন্ধ্য-পর্বত অতিক্রমের গল্প শুনি। মহাভারতের বনপর্বে কাম্যক বনে বসে লোমশ মুনির কাছে এই গল্প শুনেছিলেন যুধিষ্ঠির। একবার বিন্ধ্যপর্বত হিমালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে বড়ো করতে উদ্যত হয়েছিল, তার চেয়েও উঁচু হবে বলে। নিজেকে একটু একটু করে বাড়িয়ে সে উদ্ধত হয়ে চন্দ্র-সূর্যকে বলল তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে। কারণ এখন সে-ই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বত, হিমালয়ের মেরু পর্বত নয়। কিন্তু তার কথা না শুনে চন্দ্র-সূর্য মেরুপর্বতের চারিদিকেই ঘুরতে লাগল। এতে ভীষণ রেগে গিয়ে বিন্ধ্যাচল আরও উঁচু হয়ে সূর্যের পথ আটকে দিল। এরপর থেকে আর সূর্য-চন্দ্র দক্ষিণে যেতে পারল না, হাওয়ার গতিও হয়ে পড়ল সীমাবদ্ধ। ('ঢাকিল সূর্যের তেজ, হৈল অন্ধকার/প্রলয় হইল, যেন মানিল সংসার'—কাশীরাম দাস)

তখন স্বর্গের দেবতারা অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্যের পথে পাঠালেন এর একটা

দ্বাবিংশ শতাব্দীতে তৈরি অগস্ত্য মুনির মূর্তি

বিহিত করতে। অগস্ত্য এসে স্বচক্ষে দেখে বিন্ধ্যপর্বতকে বললেন যে তাঁকে দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে, এবং সে যেন তাঁকে যেতে দেয়। অগস্ত্যমুনির কথায় ভয় পেয়ে বিন্ধ্যপর্বত মস্তকানত করে তাঁর যাওয়ার জন্য পথ করে দিল। অগস্ত্য যাওয়ার সময় বলে দিয়েছিলেন যে যতদিন না তিনি ফিরে আসছেন ততদিন যেন বিন্ধ্যাচল এইভাবেই তার মাথা নিচু করে রাখে। সেই থেকে সূর্যের পথ আর আবদ্ধ রইল না, ধরা প্রলয় থেকে বাঁচল।

'এত বলি মুনিরাজ করিল গমন / পুনঃ যে উত্তরে নাহি গেল কদাচন'—অগস্ত্য কিন্তু আর ফিরে আসেননি। এবং বিন্ধ্যপর্বত এখনও তার পথ চেয়ে বসে রয়েছে কবে মুনিবর তাঁর অগস্ত্যযাত্রা থেকে ফিরবেন।

এবার ঋষি অগস্ত্যের কথা ছেড়ে আকাশের অগস্ত্য নক্ষত্রের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। আমরা এখন জানি (এবং যেভাবে বাবর বুঝতে পেরেছিলেন) যে অগস্ত্য নক্ষত্রকে উত্তর গোলার্ধের একটা বিশেষ অক্ষরেখা পেরোলে আর দেখা যাবে না। আমরা এও জেনেছি যে এই অক্ষাংশ হল প্রায় সাঁইত্রিশ ডিগ্রির অক্ষাংশ। এমনটা কিন্তু সব সময় ছিল না। আর এমনটা চিরদিন থাকবেও না। এমন নয় যে ওই অক্ষরেখার উত্তরে অগস্ত্যকে কখনওই আকাশে দেখা যাবে না।

সত্যি বলতে গেলে আকাশে অগস্ত্য নক্ষত্রের অবস্থান ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। শুধু অগস্ত্য নয়, সবগুলো তারাই খুব ধীরগতিতে তাদের জায়গা বদলাচ্ছে। এমনকী ধ্রুবতারার অবস্থানও 'ধ্রুব' বা অপরিবর্তনীয় নয়। আজকে যাকে আমরা ধ্রুবতারা বলে জানি, সেই তারা আর কয়েক হাজার বছর পরে পৃথিবীর উত্তর দিক চেনাতে মোটেই সাহায্য করবে না। প্রায় আট হাজার বছর পর ধ্রুবতারার এখনকার জায়গার কাছাকাছি চলে আসবে শ্রবণা নক্ষত্র। বর্তমানে শ্রবণাকে শরতের মধ্য-আকাশে দেখি, কিন্তু তখন শ্রবণা চলে যাবে ঠিক উত্তরে। তারও প্রায় চার হাজার পর এই জায়গা নেবে অভিজিৎ নক্ষত্র। এবং তার আরও চোদ্দো হাজার বছর পর ধ্রুবতারা আবার তার জায়গায় ফিরে যাবে।

প্রায় ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বিজ্ঞানী হিপারকাস্ আকাশের তারাদের এই শম্বুকগতিতে ঘোরার চিহ্ন আবিষ্কার করেছিলেন। কেন এমনটা হয়, তার কারণ অবশ্য অনেক পরে জানা গেছে। এর কারণ হল পৃথিবী তার অক্ষরেখার চারিদিকে অনবরত ঘুরছে বটে, কিন্তু তাই বলে তার অক্ষরেখাটা স্থির বসে নেই। সেটাও ধীরে ধীরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

একটা লাটিম যখন বন্‌বন করে ঘোরে, তখন সে সোজা দাঁড়িয়ে ঘোরে না। কিছুক্ষণ পরেই তার 'অক্ষরেখাটা'ও হেলে গিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করে। পৃথিবীর বেলায়ও সেই রকম হয়। লাটিমটার ক্ষেত্রে এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে চক্কর খাবার কারণ হল পৃথিবীর মহাকর্ষ এবং লাটিমের গঠন। যেহেতু লাটিমগুলো ঠিক বলের মতন গোলাকার নয়, তার ওপর মহাকর্ষের প্রভাব এক এক অংশে একেক রকম। এই সামঞ্জস্যহীন বলের জন্য লাটিমটার কৌণিক ভরবেগ ক্রমশ বদলায়, যার ফলে তার অক্ষরেখাটা ধীরে ধীরে ঘোরে।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই রকম ঘুরতে ঘুরতে চক্কর খাওয়ার কারণও হল মহাকর্ষ। এর জন্য দায়ী হল পৃথিবীর বেঢপ আকার। পৃথিবী ঠিক গোলাকার নয়, সে মেরুর দিকে চ্যাপ্টা এবং বিষুবরেখার কাছে ফুলে রয়েছে। আর এর জন্যেই চন্দ্র-সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাব সবদিকে সমান ভাবে পড়ছে না। এর ফলে লাটিমের মতো পৃথিবীর অক্ষরেখাটিও প্রতি ছাব্বিশ হাজার বছরে একবার ঘুরে আসে। এবং তার প্রভাব পড়ছে পৃথিবীর আকাশে—আকাশের তারাগুলোর অবস্থানও চক্রের মতো ঘুরছে। এই চলার গতি খুব ধীরে। আকাশে চাঁদ যত বড়, ততটুকু বড় একটা অংশ পেরোতে নক্ষত্রদের প্রায় চার হাজার বছর লাগার কথা। কিন্তু বেশ কয়েক হাজার বছর অপেক্ষা করলে দেখা যাবে যে আকাশের তারাদের জায়গা বেশ কিছুটা পাল্টে গেছে।

অন্য নক্ষত্রদের এই চক্রের মতো ঘোরার সঙ্গে অগস্ত্যও তার জায়গা থেকে ক্রমশ সরে আসছে। প্রায় ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সে উত্তরের দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু তার পর থেকে সে আবার ধীরে ধীরে দক্ষিণের পথে রওনা দিয়েছে। তার বর্তমান অবস্থান হল তার উত্তরপথের শেষ বিন্দু। এর অর্থ হল, এখন থেকে অনেক বছর আগে অগস্ত্য আকাশের আরও দক্ষিণদিকে লুকিয়েছিল।

অর্থাৎ আমরা যদি অতীতের আকাশের কথা ভাবি, তাহলে দেখব যে তখনকার আকাশে শুধু দিল্লি-কাশ্মীর কেন, দক্ষিণের অনেক জায়গা থেকেও অগস্ত্যকে দেখা যেত না। কারণ তখন অগস্ত্য ছিল আকাশের দক্ষিণপ্রান্তে। এমন এক সময় ছিল যখন দাক্ষিণাত্যেও তাকে দেখা অসম্ভব ছিল। অবশ্য সেটা অনেক আগের কথা—দশ হাজার বছর আগে, প্রস্তরযুগের সময়। তার পর থেকে ধীরে ধীরে অগস্ত্য আকাশে উত্তর দিকে চলে এসেছে। আর ক্রমশ পৃথিবীর উত্তরের অঞ্চল থেকে তাকে আকাশে দেখা গেছে।

তাহলে এও বলা যায় এক সময় আকাশের অগস্ত্য পৃথিবীর বিন্ধ্যাচল 'পেরিয়ে' এসেছিল। অর্থাৎ তাকে বিন্ধ্যের উত্তরের অঞ্চল থেকে প্রথম বারের জন্য আকাশে দেখা গিয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে অগস্ত্যমুনির দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার কাহিনির একটা প্রতিফলন পাওয়া যাচ্ছে আকাশের অগস্ত্য নক্ষত্রের উত্তরদিকে এগিয়ে চলার মধ্যে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে এটা কাকতালীয় কি না। এমন কী হয়ে থাকতে পারে যে অগস্ত্য নামে সত্যি কেউ ছিলেন যিনি ঋকবেদে উল্লেখিত ঘটনাগুলোর সময় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, এবং যিনি প্রথম দাক্ষিণাত্যে যান? হয়তো ধীরে ধীরে দক্ষিণে যাওয়ার সময় আকাশের দক্ষিণ দিগন্তের কাছে একটা অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র তাঁর চোখে পড়েছিল, যার কথা আর্যাবর্তের লোকজনের কাছে তখনও অজানা ছিল।

এক নতুন জায়গায় পৌঁছে তিনি দেখেছিলেন একটা নতুন তারা, এবং তাঁর কাছে এই ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। হয়তো সেই জন্য তাঁর নামেই তারাটার নামকরণ করা হয়েছিল।

আমাদের কিছু কিছু পৌরাণিক কাহিনিদের সঙ্গে যে প্রাচীন কালের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার একটা সম্বন্ধ রয়েছে এটা মানতে বাধা নেই। বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'ওরিয়ন' বইয়ে

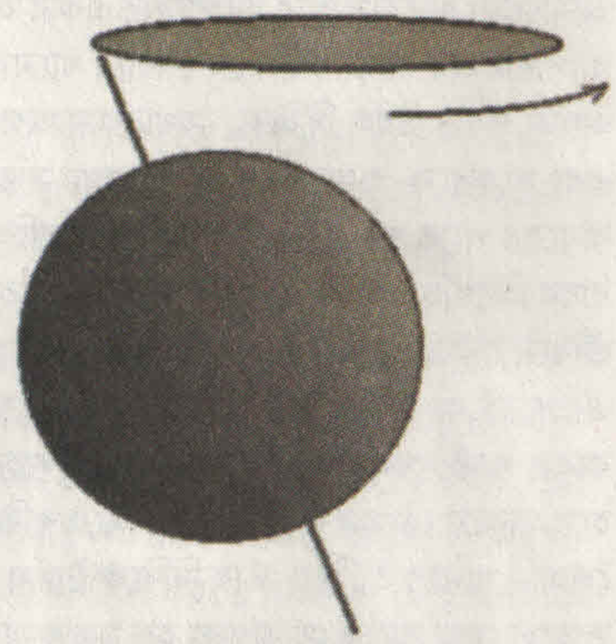

পৃথিবী তার অক্ষরেখার চারদিকে চক্কর খাওয়ার সময় এই অক্ষরেখাটিও ধীরে ধীরে আকাশে একটা বিন্দুর চারদিকে ঘোরে।

এর অনেক উদাহরণ দিয়েছেন, এবং আরও অনেকে এই নিয়ে গবেষণা করেছেন। তবে যোগাযোগগুলো যতই রোমাঞ্চকর মনে হোক না কেন, তাদের মধ্যে কোনও কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কি না সেটা যাচাই করা দরকার। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে দেখতে হবে বৈদিক ঋষি অগস্ত্যের সময়েই আকাশের অগস্ত্য নক্ষত্র বিন্ধ্যপর্বত 'অতিক্রম' করেছিল কি না।

২০০৫ সালে হায়দরাবাদ ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কৃষ্ণ দামোদর অভয়ঙ্কর এই ব্যাপারে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই বিষয়ে কোনও অঙ্ক কষার আগে অবশ্য এটা ঠিক করে নিতে হবে 'আকাশে দেখতে পাওয়ার' সঠিক সংজ্ঞা কী। শুধু দিগন্ত ছুঁয়ে থাকলেই দেখা যাবে, না কি আকাশে কিছুটা ওপরে দেখতে পেলেই আমরা তাকে দৃশ্যমান বলতে পারব, এটা ঠিক করতে হবে। অভয়ঙ্কর প্রস্তাব করেছিলেন যে দিগন্ত থেকে পাঁচ ডিগ্রি উঁচুতে থাকলেই কোনও নক্ষত্রকে দেখা গেছে বলা যেতে পারে। এই সংজ্ঞা মেনে নিলে অভয়ঙ্করের হিসেব অনুযায়ী দিল্লি (বা তার কাছাকাছি জায়গা) থেকে অগস্ত্যকে প্রায় ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম বারের মতো দেখা গিয়েছিল।

অনেকের মনে হতে পারে যে দিগন্ত থেকে পাঁচ ডিগ্রি উঁচুতে থাকা কোনও নক্ষত্রকে লক্ষ করা সহজ নয়। অনেক সময় উজ্জ্বল তারাগুলোকেও এত নিচু আকাশে দেখা যায় না। দিগন্তে বনাঞ্চল, গাছ-গাছালি তো আছেই, তা ছাড়া বাতাসে রয়েছে ধুলো। এর জন্য দিগন্তের কাছের আকাশের নক্ষত্রেরা অনেক সময় দৃষ্টির অগোচরে রয়ে যায়। হয়তো পাঁচের বদলে দশ ডিগ্রি হলে নক্ষত্রের দর্শনের সংজ্ঞাটা আরও সঠিক হয়। এই নতুন সংজ্ঞা মেনে নিলে দেখা যাচ্ছে যে দিল্লির মতো অক্ষাংশ থেকে অগস্ত্যকে প্রথম বারের মতো দেখা যাবে প্রায় ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

বেদ, বিশেষ করে, ঋকবেদ কখন লেখা হয়েছিল সেই নিয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ রয়েছে। তবে এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে ওপরে নির্ধারিত সময়সীমা, অর্থাৎ প্রায় এক থেকে তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী কোনও সময়েই এই বৈদিক যুগের ছিল। দিল্লির কথা না ভেবে আরও উত্তরের কোনও জায়গা, যেমন সুলতানের কথা ভাবলে এই সময়সীমা দাঁড়াবে কয়েকশো থেকে দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। তাই দেখা যাচ্ছে যে অগস্ত্য নক্ষত্রের উত্তর ভারতের আকাশে দেখা দেওয়াটা ঐতিহাসিক সময়েই ঘটেছিল, এবং তার সঙ্গে প্রচলিত কাহিনির একটা অনুরণন থাকতেই পারে । দুটো ঘটনা যে এই ভাবে প্রায় সমসাময়িক হয়ে দাঁড়াচ্ছে এটা মনে নিশ্চয় চমক লাগায়—আকাশের একটা বিশেষ নক্ষত্রের উত্তর ভারতের আকাশে প্রথম দেখতে পাওয়া, এবং ওই অঞ্চলে এমন কিছু কাহিনি রচনা, যার এক চরিত্রের নামের সঙ্গে ওই নক্ষত্রের সম্পর্ক আছে।

আকাশের অগস্ত্য কিন্তু এখন আবার দক্ষিণপথে চলেছে। অর্থাৎ আর কয়েক হাজার বছর পর তাকে উত্তর ভারত থেকে দেখা যাবে না। প্রায় চার হাজার বছর পর দিল্লির মতো অক্ষাংশ থেকে আকাশে অগস্ত্য কিন্তু হারিয়ে যাবে। সে আবার বিন্ধ্যপর্বত 'পেরিয়ে' আরও দক্ষিণের আকাশে চলে যাবে। প্রায় দশ হাজার বছর পর কন্যাকুমারী থেকেও আর তাকে দেখা যাবে না। অবশ্য আমাদের আকাশ থেকে সে চিরদিনের মতো চলে যাবে না —এটা যাকে বলে অগস্ত্যযাত্রা মোটেই নয়। আরও কয়েক হাজার বছর পর তাকে আবার দেখা যাবে ভারতের আকাশে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে অগস্ত্য নক্ষত্রের এমন কী বিশেষত্ব রয়েছে যে তাকে নিয়ে প্রাচীন ভারতে এমন জল্পনাকল্পনা করা হয়েছিল। ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অগস্ত্য নক্ষত্রকে যে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন তার প্রমাণ রয়েছে। অতি প্রাচীন কালের কথা জানা না থাকলেও, আর্যভট্টের সময়ে যে অগস্ত্যের পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। যখন কোনও নক্ষত্রকে সূর্য ওঠার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রথম বার উদয় হতে দেখা যায়, সে দিন সেই নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। একেই বলা হয় 'নক্ষত্রের উদয়' (হেলিয়াক্যাল রাইজিং)। আর্যভট্টের বইতে অগস্ত্যের উদয় নিয়ে লেখা বিশেষ শ্লোক রয়েছে।

বর্তমানে ধ্রুবতারা উত্তরের দিশা নির্ধারণ করালেও কয়েক হাজার বছর পর তা আর সম্ভব নয়। তখন শ্রবণা, অভিজিৎ-এর মতো অন্য তারারা ধ্রুবতারার জায়গা নেবে।

প্রচলিত লোককথায় অগস্ত্যের উদয়ের সঙ্গে উত্তর ভারতে বর্ষার শেষের একটা সম্পর্ক রয়েছে। লক্ষ করা যায় যে মধ্য এবং উত্তর ভারতে অগস্ত্যের উদয় হত অগাস্ট মাসের শেষে, অর্থাৎ ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি, শরতের প্রারম্ভে। হয়তো এই জন্যই অগস্ত্যের উদয়ের পর্যবেক্ষণ এক সময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেমন লুব্ধক (সিরিয়াস) নক্ষত্রের উদয়ের সঙ্গে মিশরে নীলনদের বন্যার সম্পর্ক ছিল। তাই মনে করা যায় যে ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে অগস্ত্যের পর্যবেক্ষণের একটা পরম্পরা ছিল, এবং সেটা প্রাচীন কাল থেকেও চলে আসতে পারে।

অগস্ত্যের তামিল সাহিত্যে অবদানের কথা মনে রেখেও অনেকবার করতে চেষ্টা করেছেন তিনি কবেকার লোক ছিলেন। বলা হয় যে তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে তিনটি 'সঙ্গম' অর্থাৎ সম্মেলন হয়েছিল, যার প্রথমটা নাকি আয়োজন করেছিলেন অগস্ত্যমুনি নিজে। এই সঙ্গমের সময় সম্বন্ধে অবশ্য প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে—কারও মতে প্রথম সঙ্গমের যুগ ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, আবার অন্যদের মতে প্রায় ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই সম্মেলনগুলো আদৌ ঐতিহাসিক ঘটনা কি না সে নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অবশ্য এটাও ঠিক যে এই সব ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োগ সব সময় সঠিক উত্তর নাও দিতে পারে। আমরা যেমন দেখেছি যে আকাশে নক্ষত্রের দেখা দেওয়ার সংজ্ঞাটা পাঁচ থেকে দশ ডিগ্রিতে বদলালে সময়ের ব্যাপারে কয়েক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে। তাই এই ভাবে সময় নির্ধারণের মধ্যে বেশ বড় ধরনের ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক।

এটা অবশ্য মানতেই হবে শুধু এই যোগাযোগ থেকে কোনও সত্যিকারের প্রমাণ হয় না। তবে এই অদ্ভুত যোগাযোগের কথা ভেবে মনে যে রোমাঞ্চ জাগে তাতে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে সত্যিই কি আর্যাবর্তে এমন বিখ্যাত কোনও লোক ছিলেন যিনি এক সময় দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছিলেন? আর যাবার পথে দেখেছিলেন একটা নতুন তারা, যার খবর তখনও উত্তরের বাসিন্দাদের কাছে ছিল অজানা? ❖

অলঙ্করণ: রৌদ্র মিত্র